HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৫ • সংখ্যা ২ • জুন ২০০৭
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশে পুরুষদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-আচরণ এবং এইচআইভি বিস্তারে তার প্রভাব

পৃষ্ঠা ১৪

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগজনিত সমস্যা

পৃষ্ঠা ২০

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

গর্ভপাতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে গর্ভপাত-সংক্রান্ত মাতৃমৃত্যুর হার কমে যাচ্ছে

এই প্রতিবেদনে আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকার উপাত্ত ব্যবহার করে গর্ভপাতের হার এবং অনিরাপদ গর্ভপাতের ফলে মৃত্যুর হার নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের হার বেড়ে গেছে বলে সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয়েছে (অভয়নগর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি হাজারে গর্ভপাতের অনুপাত ৪০ থেকে ১০০তে বেড়ে গিয়েছে)। একই সময়ে গর্ভপাত-সংক্রান্ত মাতৃমৃত্যুহার কমে প্রতি লাখে আনুমানিক ১০০ থেকে ২৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেইসাথে অন্যসব কারণেও মাতৃমৃত্যুহার কমে গেছে। গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যুহার কমে গেলেও মাতৃমৃত্যুর একটি কারণ হিসেবে গর্ভপাতের গুরুত্ব যেহেতু এখনো অব্যাহত রয়েছে, সেহেতু অনিরাপদ গর্ভপাত কমানোর লক্ষ্যে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী অনিরাপদ গর্ভপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা – কারণ, মহিলা ও মেয়েদের জীবনের ওপর এর সরাসারি প্রভাব রয়েছে। যদিও একথা সত্যি যে, অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত মৃত্যু রোধ করা সম্ভব, তথাপি অনেক উন্নয়নশীল

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

দেশে এটি এখনো মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ হিসেবে বিদ্যমান। অধিকাংশ দেশে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করে, অথবা অবৈধ গর্ভধারণ প্রতিরোধের মাধ্যমে বিষয়টি মোকাবেলা করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)-সম্পর্কিত সেবাদানের বিষয়টি বাংলাদেশে একটি ব্যাতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা। এমআর হচ্ছে, "জরায়ু নিষ্কাশনের মাধ্যমে গর্ভধারণের ঝুঁকির মধ্যে থাকা একজন মহিলাকে গর্ভহীন রাখার উপায়। এক্ষেত্রে ওই সময় মহিলার গর্ভধারণ নিশ্চিত না হলেও পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়"। জাতীয় মাসিক নিয়মিতকরণ কর্মসূচি গর্ভধারণ-সংক্রান্ত সেবাদানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একটি অনন্য বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি এবং শুরু থেকেই এটি মহিলাদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র থেকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। যদিও এটি ধারণা করা হয় যে, এমআর সুবিধা থাকার ফলে অনিরাপদ গর্ভপাত কমেছে, তবে কর্মসূচিটি পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করা হয় নি। সুতরাং বাংলাদেশে গর্ভপাতের ব্যাপকতা এবং এ-সংক্রান্ত ঝুঁকি নির্ধারণ করার জন্য গর্ভপাত এবং এমআর উভয় অবস্থা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

১৯৮২-২০০৪ সাল পর্যন্ত বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের অনুপাত এবং মোট গর্ভপাতের পরিমাণ জানার জন্য অভয়নগর, মতলব এবং মিরসরাই-এ আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকার উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৬-২০০১ সাল পর্যন্ত মাতৃমৃত্যুর কারণ এবং মাতৃমৃত্যুহারের পরিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য মতলবে মৃত মহিলাদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে গর্ভপাতজনিত মাতৃমৃত্যুর পরিসংখ্যান একমাত্র মতলব থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়। এধরনের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একজন সাক্ষাৎগ্রহণকারী ব্যক্তি (ইন্টারভিউয়ার) মতলব সার্ভিলেন্স এলাকার প্রজননক্ষম একজন মহিলার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তার পরিবারের জীবিত সদস্যদের কাছ থেকে তার মৃত্যুসম্পর্কিত কারণসমূহ জেনে নেন। এভাবে বিস্তারিত জানার পর (ভারবাল অটোপসি) মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করা হয়।

বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের (ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত ও এমআর) প্রবণতা

গর্ভপাতের হার (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গর্ভপাতের সংখ্যাকে ওই সময়ের মোট জীবন্তপ্রসব সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে বের করা হয়) হচ্ছে একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটানোর সম্ভাবনাসম্পর্কিত একটি নির্দেশক (প্রোক্সি)। চিত্র ১-এ ২০০৪ সাল পর্যন্ত অভয়নগর ও মতলবে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বি এবং সরকারি উভয় সেবাদান এলাকার বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের যে হার দেখানো হয়েছে তা পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতা হিসেবে এসেছে। ১৯৯৪ সালে মিরসরাইয়ে সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের শুরু থেকে সংগৃহীত সেখানকার উপাত্ত নেওয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোনো গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি থেকে মিরসরাইয়ে বিবাহিত মহিলাদের গর্ভপাতের অনুপাত যেখানে প্রায় একই অবস্থানে রয়েছে, অর্থাৎ প্রতি হাজার জীবন্তপ্রসবে ৬০-এর নিচে, সেখানে প্রায় একই সময়ে অভয়নগরে এ-অনুপাত আনুমানিক দ্বিগুণ হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি হাজার জীবন্তপ্রসবে এ-অনুপাত ৪০

থেকে বেড়ে ১০০-এরও বেশি হয়েছে। মতলবে আইসিডিডিআর,বির এলাকায় এবং সরকারি সেবাদান এলাকায়ও বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের অনুপাত বেড়েছে, তবে সরকারি এলাকায় ১৯৮০ সাল থেকে খুব ধীরে এর বৃদ্ধি ঘটেছে। আইসিডিডিআর,বি এলাকায় এর বৃদ্ধি ঘটেছে প্রধানত ১৯৯৮ সালের পর। পরবর্তী সময়ে সরকারি এলাকায় পর্যায়ক্রমে এ-অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ১: ১৯৮২-২০০৪ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকায় বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের অনুপাত

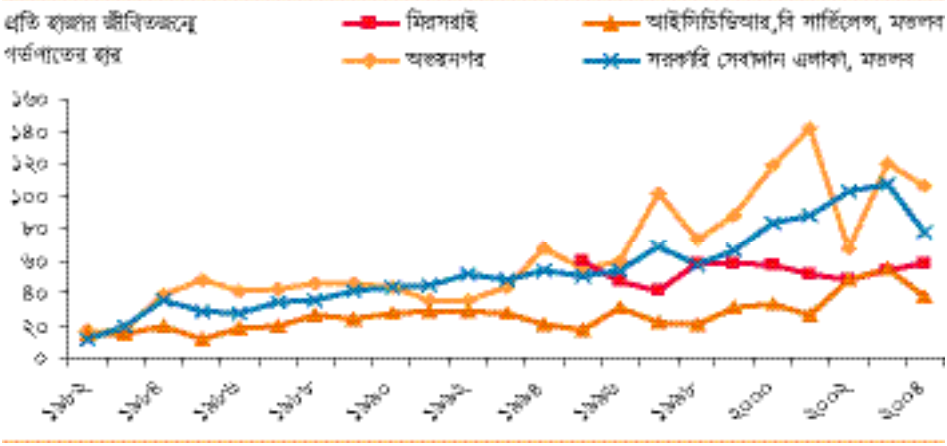

গর্ভপাতের অনুপাত যেহেতু একজন গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটানোর সম্ভাবনাসম্পর্কীত একটি নির্দেশক মাত্র (প্রক্সি), সেহেতু এ-অনুপাত থেকে মহিলাদের গর্ভপাতের সংখ্যা নির্ণয় করার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় না। গর্ভপাতের মোট হার হচ্ছে বিকল্পভাবে তৈরি একটি হার, যা গর্ভধারণের মোট হারের মতো (টিএফআর) গণনা করা হয়, অর্থাৎ একবছরে একটি নির্দিষ্ট বয়সের মহিলাদের গর্ভপাতের সংখ্যা গণনা করে তাকে ওই বয়সী মহিলাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে এবং তার সাথে বয়সভিত্তিক হারসমূহ যোগ করে এ-সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। গর্ভপাতের মোট হার দ্বারা একজন মহিলার গর্ভধারণ ক্ষমতা থাকাকালীন সময়ের মধ্যে গর্ভপাতের সম্ভাব্য আনুমানিক সংখ্যা নির্দেশ করে (যদি বর্তমান বয়সভিত্তিক গর্ভপাতের একই হার বিরাজমান থাকে)। চিত্র ২-এ ১৯৯৬-২০০৪ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বির প্রত্যক সার্ভিলেন্স এলাকার প্রজননক্ষম বিবাহিত মহিলাদের গর্ভপাতের মোট হার দেখানো হয়েছে (প্রতি হাজারে)।

গর্ভপাতের মোট হার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের এবং মতলব সরকারি এলাকায় ও অভয়নগরে এ-হার সর্বোচ্চ, অন্যদিকে মতলব আইসিডিডিআর,বি এলাকায় এ-হার সর্বনিম্ন। মিরসরাইয়ে বিবাহিত মহিলাদের গর্ভপাতের হার বিগত বছরগুলোতে মোটামুটি একই অবস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, মতলবের উভয় এলাকায় এ-হার এরমধ্যে বেড়ে গেছে – সরকারি এলাকায় ২০০-এর কাছাকাছি থেকে ৪০০ এবং আইসিডিডিআর,বি এলাকায় ১০০-এর কম থেকে প্রায় ২০০ পর্যন্ত

বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়নগরের চিত্র এক্ষেত্রে খুব একটা পরিষ্কার নয় – এখানে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এ-হার বৃদ্ধি পেয়েছিলো, কিন্তু ২০০১ সালের পরে পুনরায় এ-হার কমে যায়। তবে ২০০১ সালের সর্বোচ্চ হারের পূর্বের তুলনায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ-হার মোটামুটি বেশি। ২০০৪ সালে গর্ভপাতের মোট হার প্রায় সব জায়গায় কমে যাওয়ার ফলে এর কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

চিত্র ২: ১৯৯৬-২০০৪ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকার প্রজননক্ষম বিবাহিত মহিলাদের গর্ভপাতের মোট হার (প্রতি হাজারে)

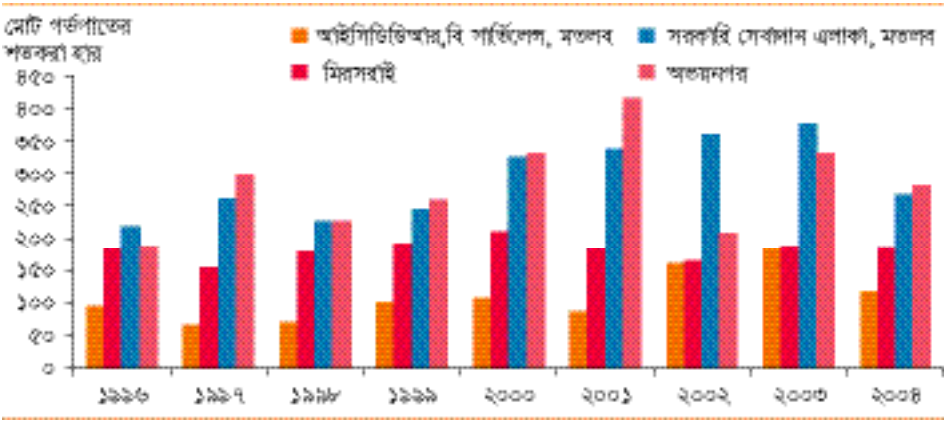

গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যু

মৃত মহিলাদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৯৭৬-২০০৫ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকায় গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যুসহ সব কারণে মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এ-সময়ে উক্ত এলাকায় গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যুহার প্রতি লাখে পর্যায়ক্রমে ৯৯ থেকে ১২তে নেমে এসেছে। সরকারি এলাকায়ও গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যুহার কমেছে – যেখানে ১৯৮১-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রতি এক লাখ গর্ভবতী মহিলার মধ্যে সর্বোচ্চ ১০৭ জন মারা গেছেন, সেখানে ২০০১-২০০৫ সালে প্রতি এক লাখ গর্ভবতী মহিলার মধ্যে মাত্র ২৪ জন মারা গেছেন। তবে, ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত আইসিডিডিআর,বি এলাকার তুলনায় সরকারি এলাকায় গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা (প্রতি এক লাখ গর্ভবতী মহিলার মধ্যে) প্রায় দ্বিগুণ।

১৯৭৬-১৯৮৫ এবং ১৯৯৬-২০০৫ সালের মধ্যে আইসিডিডিআর,বি এলাকায় গর্ভপাত-সংক্রান্ত মাতৃমৃত্যুর হার ২৪% থেকে কমে ১১% হয়েছে (চিত্র ৩) (২)। সরকারি এলাকায় এ-প্রবণতা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না – সেখানে ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত গর্ভপাত-সংক্রান্ত মাতৃমৃত্যুর হার ছিলো ১৭%, ১৯৮৬-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ছিলো ২২% এবং ১৯৯৬-২০০৫ সাল পর্যন্ত ছিলো ১৫%। উভয় এলাকার সাম্প্রতিক এ-হারকে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশের ২০০০ সালের হারের (১৩%) সাথে তুলনা করা যায় (৩) এবং বাংলাদেশে ইতোপূর্বে প্রকাশিত হারের থেকে তা কম (৪,৫)।

চিত্র ৩: মতলবে আইসিডিডিআর,বি এবং সরকারি এলাকায় মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহ, ১৯৭৬-২০০৫

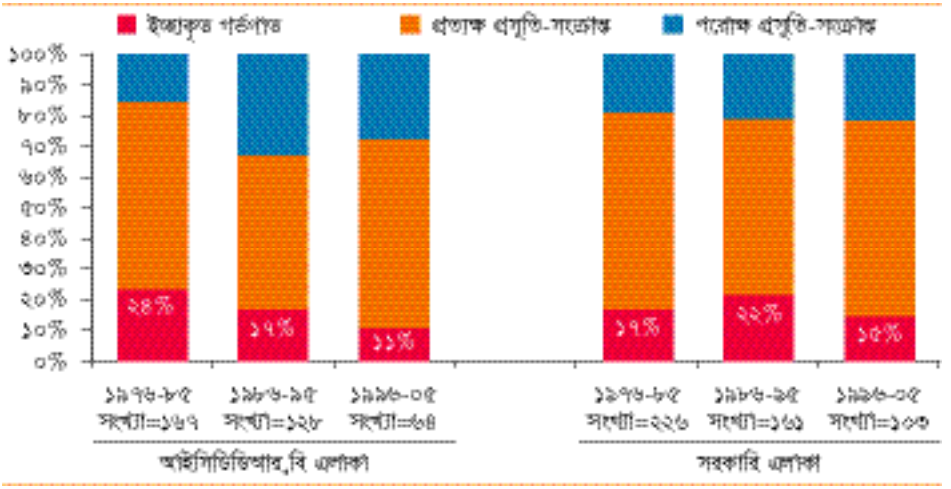

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন এবং পাবলিক হেলথ সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: আইসিডিডিআর,বি

মন্তব্য

গর্ভপাতের অনুপাত এবং হার থেকে মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর) এবং গর্ভপাতের যে হার বের করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, অন্তত বাংলাদেশের কিছু এলাকায় হলেও এমআর এবং গর্ভপাতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আলোচ্য উপাত্তসমূহে সেই খবরটিই গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, গর্ভপাত/এমআর-এর সংখ্যা এবং গর্ভপাত/এমআর-এর মাধ্যমে একটি গর্ভের পরিসমাপ্তি ঘটার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গর্ভপাত/এমআর-এর পরিসংখ্যানে যে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ব্যবধান রয়েছে, তাও এ-উপাত্ত থেকে বোঝা যায়। এ-ধরনের ব্যবধান বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য সমীক্ষার (২০০৪) উপাত্তেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে দেখা যায় যে, বরিশালে সবচেয়ে বেশি মহিলা (১০.১%) এমআর পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং চট্টগ্রামে করেছেন সবচেয়ে কম (৪.২%)। এছাড়া, গ্রামের মহিলাদের তুলনায় শহুরে মহিলারা প্রায় দ্বিগুণ হারে গর্ভপাত/এমআর করেছেন বলে মনে হয়েছে।

গর্ভপাত-সংক্রান্ত অন্যান্য গবেষণার মতো এই গবেষণায়ও দেখা যায় যে, বিষয়টি অবৈধ বা রক্ষণশীল হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মহিলারা তাঁদের গর্ভপাত-সংক্রান্ত যে খবর প্রকাশ করেন তা সত্যিকার গর্ভপাতের সংখ্যা থেকে সম্ভবত কম। সুতরাং উল্লিখিত উপাত্ত খুব সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করা উচিত। মহিলাদের গর্ভপাত এবং এমআর-এর হারে আসলে যে পরিবর্তন হয়েছে, তার

পরিবর্তে ওইসব প্রতিবেদনে গর্ভপাত এবং এমআর-সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে মহিলাদের ইচ্ছার পরিবর্তনের কথাও প্রতিফলিত হতে পারে। একইভাবে আইসিডিডিআর,বি এবং সরকারি এলাকা থেকে প্রকাশিত হারের মধ্যে যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছে সে বিষয়েও পুনরায় গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। উল্লিখিত এলাকাসমূহের মধ্যে গর্ভপাত এবং এমআর-এর হারে প্রকৃত অর্থেই যেখানে পার্থক্য থাকতে পারে, সেখানে উপাত্ত সংগ্রহকারীদের আচার-ব্যবহারের কারণে, অথবা আইসিডিডিআর,বির গর্ভপাত-সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে মহিলাদের পূর্বধারণার ফলেও গর্ভপাত এবং এমআরের প্রকৃত হারের সাথে উপাত্ত থেকে পাওয়া হারের ব্যবধান থাকতে পারে।

অন্তত বাংলাদেশের কিছু এলাকায় গর্ভপাত এবং মাসিক নিয়মিতকরণের হার যেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে গর্ভপাতজনিত মৃত্যুর সংখ্যা কমে গেছে বলে প্রতীয়মাণ হচ্ছে। তবে গর্ভপাত এখনো মাতৃমৃত্যুর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বিদ্যমান। এই গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, যদিও অনিরাপদ গর্ভপাত এখনো ঘটে চলেছে, তথাপি এমআর কর্মসূচি গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যুহারের ওপর একটি ধনাত্মক (পজিটিভ) প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হয়। অনিরাপদ গর্ভপাতের ফলশ্রুতিতে মহিলাদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির পরিমাণও বেড়ে যেতে পারে, যদিও এ বিষয়ে কোনো তথ্য বা উপাত্ত এখানে তুলে ধরা হয় নি। গর্ভপাত-সংক্রান্ত মৃত্যু এবং অসুস্থতা উভয়ই মহিলাদের জীবনে, তাঁদের পরিবারে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল হতে যে বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া যায় তা হলো – অনিচ্ছাকৃত গর্ভ এবং অনিরাপদ গর্ভপাত রোধ করার জন্য সব মহিলা যাতে প্রয়োজনে মাসিক নিরাপদ এবং নিয়মিতকরণের পদ্ধতি নিতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং গর্ভপাত-সংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত মহিলাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করাও দরকার।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশে পুরুষদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-আচরণ এবং এইচআইভি বিস্তারে তার প্রভাব

বাংলাদেশের ৬টি জেলায় (৩টি শহরাঞ্চলে এবং ৩টি গ্রামাঞ্চলে) ৭,১২২ জন পুরুষের (১৮-৪৯ বছর-বয়সী) যৌন-আচরণ নিয়ে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। এতে দেখা যায় যে, গত এক বছরে মোটের ওপর ১৮% পুরুষ বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে (১০% নারী-যৌনকর্মীদের সাথে, ৯% সাধারণ নারী-সঙ্গীদের[১] সাথে এবং ২% পুরুষ কিংবা হিজড়াদের সাথে)। জরিপে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের মধ্যে গত বছর যারা বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে, তাদের ৩৫% সর্বশেষ যৌন-সঙ্গমে কনডম ব্যবহার করেছে এবং বেশিরভাগ (৫৬%) পুরুষ একাধিক সঙ্গীর সাথে যৌন-সঙ্গম করেছে। বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম সবচেয়ে বেশি করেছে তারা, যাদের বয়স ছিলো ৩০ বছরের কম (২৪%), যারা ছিলো অবিবাহিত (২৭%) এবং যারা ১০ বছরের কম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে (২০%)। কনডম ব্যবহারের হার কম ছিলো সেসব লোকের মধ্যে, যাদের বয়স ছিলো ৪০ বছর বয়সসীমার মধ্যে (২৪%), যারা বিবাহিত ছিলো (৩০%), এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কে যাদের জ্ঞান কম ছিলো (১৫.৪%), যাদের কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো না (২২%) এবং যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ছিলো নিচে (২৩%)। বাংলাদেশের সাধারণ শ্রেণীর পুরুষ সচরাচর উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-সঙ্গীর (যেমন, নারী যৌনকর্মী) সাথে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করে থাকে। কনডম ব্যবহারের কম হার এবং একাধিক সঙ্গীর সাথে যৌন-সঙ্গম সমাজে এইচআইভি-সংক্রমণের ঝুঁকি আরো বাড়িয়ে তোলে। এইচআইভি-সংক্রমণের মহামারি ঠেকাতে যৌন-সঙ্গী পরিবর্তনের হার কমানো এবং কনডম ব্যবহারের হার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে কার্যকরভাবে আচরণ পরিবর্তন-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

শিরায় মাদক গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী বাদে (১.৫%), বাংলাদেশে সবচেয়ে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (যৌনকর্মী, সমকামী, হিজড়া, হেরোইনসেবী, পরিবহন শ্রমিক, প্রভৃতি) মধ্যে এইচআইভি জীবাণুর উপস্থিতি এখনো কম (<১%) (১)। এ-পর্যন্ত এইচআইভি প্রতিরোধে নেওয়া প্রায় সব কর্মসূচিই এসব জনগোষ্ঠীকে ঘিরে পরিচালিত হয়েছে। সাধারণ পুরুষ জনগোষ্ঠীর যৌন-আচরণ এবং তাদের যৌনকর্মের পরিধি সম্পর্কে (সেক্সুয়াল নেটওয়ার্ক) সীমিত তথ্য রয়েছে। যৌনসম্পর্কিত তাদের এসব আচরণ এবং এর পরিধি সম্পর্কে জানতে পারলে এদেশে এইচআইভি-সংক্রমণের সম্ভাব্য গতি-প্রকৃতি চিহ্নিত করা যেতে পারে। গবেষণাটির উদ্দেশ্য হলো, সমাজে পুরুষদের নানা রকম বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-আচরণের ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষের মধ্যে উল্লিখিত আচরণের পার্থক্য খুঁজে বের করাও গবেষণাটির আরেকটি উদ্দেশ্য।

[১] প্রতিবেশী নারী, বান্ধবী অথবা আত্মীয় যার সাথে একজন পুরুষ অর্থের বিনিময় ছাড়াই যৌন-সঙ্গম করেছে

ফেব্রুয়ারি-আগস্ট ২০০৫ সময়কালে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশের তিনটি শহুরে (ঢাকা মহানগর, চট্টগ্রাম মহানগর এবং বগুড়া শহর) এবং তিনটি গ্রামীণ অঞ্চলের (ফরিদপুর, রাজশাহী এবং কক্সবাজার জেলা) ১৮-৪৯ বছর-বয়সী পুরুষদের মধ্যে একটি জরিপ চালানো হয় (চিত্র ১)। সাক্ষাৎদানকারী নির্বাচনের জন্য প্রতিটি গবেষণা এলাকায় বহুস্তরভিত্তিক গুচ্ছ নমুনা পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়। শহুরে এলাকায় 'মহল্লা' (সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটির কোনো এলাকার সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ) এবং পল্লী এলাকায় 'মৌজা' (সরকারি তালিকাভুক্ত রাজস্ব গ্রাম)-কে গুচ্ছ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

চিত্র ১: গবেষণা এলাকা (নির্বাচিত জেলাসমূহ)

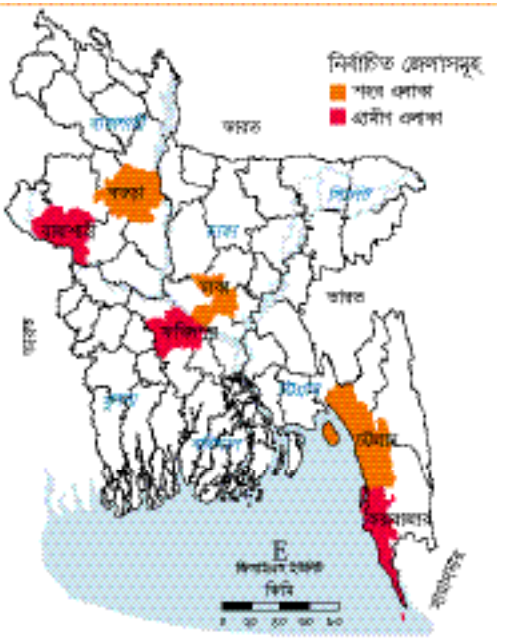

প্রতিটি গবেষণা এলাকায় সম্ভাবনা-অনুপাত-আকার অনুযায়ী ৩০টি গুচ্ছ এলাকা নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি গুচ্ছ এলাকার তালিকাভুক্ত খানাসমূহে (প্রতিটি পরিবার যারা আলাদাভাবে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে এবং একত্রে বসবাস করে) যেসব যোগ্য সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তি ছিলো তাদের মধ্য থেকে সাক্ষাৎদানকারী সব ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়, এবং এভাবে (১৮-৪৯ বছর-বয়সী পুরুষ, যারা অন্তত গত এক বছর ধরে গবেষণা এলাকায় বসবাস করেছে অথবা গত এক বছরে তারা তাদের বাড়িতে অন্তত একবার বেড়াতে এসেছে) ৫০ জনকে পদ্ধতিগতভাবে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়। সেচ্ছায় যারা সম্মতি প্রদান করেছে, প্রথাগত সরাসরি সাক্ষাৎকার অথবা গোপন ব্যালট বাক্স (অডিও সাপোর্টসহ, অর্থাৎ টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত প্রশ্নাবলি হেডফোনের মাধ্যমে একাকী শুনে তার উত্তর কাগজে লিখে একটি বাক্সে ফেলা) – এই দুই পদ্ধতির যেকোনো একটির মাধ্যমে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। নিবন্ধটি সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য শুধুমাত্র সামস্টিক ধারণাগুলো তুলে ধরা হলো। যৌন-আচরণের ভিন্নতা পদ্ধতিগতভাবে অন্য স্থানে বর্ণনা করা আছে (২)। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ সাক্ষাৎগ্রহণকারীরা সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছেন।

নানাবিধ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন-আচরণের প্রচলিত সংজ্ঞা

'বিয়ে-বহির্ভূত যৌনতা' বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো, "সাক্ষাৎদানকারী এমন কারো যোনী বা পায়ুপথে যৌন-সঙ্গম করেছে, যার সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক নেই"। 'নারী যৌনকর্মী' বলতে এমন নারীকে বোঝানো হয়েছে, "যে অর্থের বিনিময়ে যোনী বা পায়ুপথে যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত

হয়েছে”। ‘সাধারণ নারী-সঙ্গী’ বলতে “প্রতিবেশী নারী, বান্ধবী অথবা আত্মীয়কে বোঝানো হয়েছে, যার সাথে সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তি অর্থের বিনিময় ছাড়াই যোনী অথবা পায়ুপথে যৌন-সঙ্গম করেছে”। ‘পুরুষ/হিজড়া’ বলতে “সেই পুরুষ বা হিজড়াকে বোঝানো হয়েছে, যাকে অন্য কোনো পুরুষ সক্রিয়ভাবে (অ্যাক্টিভলি) বা তার নিজের ইচ্ছায় (প্যাসিভলি) তার পায়ুপথে যৌন-সঙ্গম করেছে”।

উল্লেখযোগ্য ৯,০০০ ব্যক্তির মধ্যে ৭,১২২ (৭৯%) জন পুরুষের সাথে সাক্ষাৎকার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে ৩,৬২৩ জনকে মুখোমুখি এবং ৩,৪৯৯ জনকে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। যে কারণে কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি তা হলো – তাদের কেউ কেউ দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলো (১২%) এবং পাঁচবার গিয়েও কাউকে কাউকে তাদের বাড়িতে পাওয়া যায় নি (৮%)। শুধুমাত্র ৩৮ জন (০.৪%) অংশগ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলো।

সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের প্রেক্ষাপটগত বৈশিষ্ট্য

সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের ৫২%-ই ছিলো শহরবাসী। প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তির বয়স ছিলো ২০-৩৯ বছরের মধ্যে এবং ২০ বছরের কম-বয়সী সাক্ষাৎদানকারীর সংখ্যা ছিলো ১০%-এর কম। শতকার ২২ জন কখনও স্কুলে যায় নি এবং ৩০% ১০ বছরের বেশি সময় ধরে স্কুল-কলেজে পড়েছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তি (৩২%) ছিলো অবিবাহিত। গবেষণায় সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিগণের বেশিরভাগই ছিলো মুসলমান। অর্ধেকের বেশি সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তির (৫৯%) মাসিক সংসার খরচ ছিলো ৫,০০০ টাকা অথবা তার থেকে কম। তবে ৩০%-এর মাসিক খরচ ছিলো ৫,০০০-১০,০০০ টাকা। তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তি চারটি পেশাজীবী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো, যেমন, সাধারণ চাকরি, ব্যবসা, কৃষি এবং পরিবহন শ্রমিক।

সঙ্গীভেদে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমের ব্যাপ্তি

মোটের ওপর ১৮% সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তি গত এক বছরে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে বলে জানিয়েছে (১০% নারী-যৌনকর্মীদের সাথে, ৯% সাধারণ নারী-সঙ্গীদের সাথে এবং ২% পুরুষ/হিজড়াদের সাথে) (চিত্র ২)।

চিত্র ২: সঙ্গীভেদে ১৮-৪৯ বছর-বয়সী পুরুষদের গত এক বছরে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমের শতকরা হার

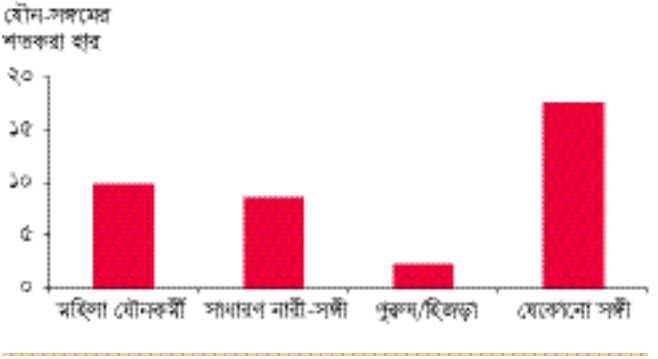

সামাজিক-জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমের পার্থক্য

ছয়টি পৃথক স্থানে পুরুষদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমের আনুপাতিক হার প্রায় সমান (সারণি ১)। সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯ বছর বা তার থেকে কম-বয়সী পুরুষদের ২৫% গত এক বছরে অন্তত একবার যৌন-সঙ্গম করেছে। বয়সসীমা বাড়ার সাথে এই অনুপাতও কমে গেছে। চল্লিশ বা তার থেকে বেশি-বয়সী পুরুষদের মধ্যে মাত্র ৯% গত এক বছরে এ-ধরনের যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে (সারণি ১)। তাছাড়া, বিবাহিত পুরুষদের (১৩%) তুলনায় অবিবাহিত পুরুষেরা (২৭%) বেশি বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে। দশ বছরের কম সময় স্কুলে পড়েছে এমন পুরুষদের (২০%) থেকে যারা ১০ বছর বা ততোধিক সময় স্কুল-কলেজে পড়েছে তারা তুলনামূলকভাবে কম (১৩%) বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী পুরুষদের (১৩%) থেকে মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমের হার বেশি (১৮%) দেখা গেছে। যেসব পুরুষের মাসিক পারিবারিক খরচ ১০,০০০ টাকার বেশি তাদের (১২%) তুলনায় যাদের মাসিক পারিবারিক খরচ ১০,০০০ টাকার (১৪১ মার্কিন ডলার) কম, তারা

সারণি ১: নির্বাচিত আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা গত এক বছরে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে তাদের শতকরা হার

আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা	সাক্ষাৎদানকারীদের শতকরা হার
গবেষণা এলাকা		
ঢাকা মহানগর	১,২২৭	১৭
চট্টগ্রাম মহানগর	১,২৪৪	১৭
বগুড়া শহর	১,২০৩	২০
ফরিদপুর পল্লী এলাকা	১,০৫৫	১৭
কক্সবাজার পল্লী এলাকা	১,১৯৭	২১
রাজশাহী পল্লী এলাকা	১,১৯৬	১৭
পি ভ্যালু		০.০১
বয়স (বছর)		
≤১৯	৬৭৭	২৫
২০-২৯	২,৭৫০	২৩
৩০-৩৯	২,১৫৪	১৩
≥৪০	১,৫৪১	৯
পি ভ্যালু		<০.০১
বৈবাহিক অবস্থা		
অবিবাহিত	২,২৪৬	২৭
বিবাহিত	৪,৮৭৬	১৩
পি ভ্যালু		<০.০১
শিক্ষা জীবন (বছর)		
০	১,৭২২	১৮
১-৪	১,১৭৮	২১
৫-৯	২,২৩০	২০
≥১০	১,৯৯২	১৩
পি ভ্যালু		<০.০১
ধর্মীয় পরিচয়		
ইসলাম	৬,৪১৯	১৮
অন্যান্য (হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান)	৭০৩	১৩
পি ভ্যালু		০.০২
মাসিক পারিবারিক খরচ		
≤৩,০০০	২,৫৯৯	১৭
৩,০০১-৫,০০০	২,২৩১	১৮
৫,০০১-১০,০০০	১,৮১৩	১৯
>১০,০০০	৪৭৯	১২
পি ভ্যালু		০.০২

(১৮%) বেশি বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে।

কনডম ব্যবহারের ব্যাপ্তি

শেষ বার যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত পুরুষদের ৪০% নারী-যৌনকর্মীদের সাথে, ৩০% সাধারণ নারী-সঙ্গীদের সাথে এবং ৯% পুরুষ/হিজড়াদের সাথে তাদের যৌন-সঙ্গমের সময় কনডম ব্যবহার করেছে (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: বিভিন্ন ধরনের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গীর সাথে সর্বশেষ যৌন-সঙ্গমে পুরুষদের কনডম ব্যবহারের হার

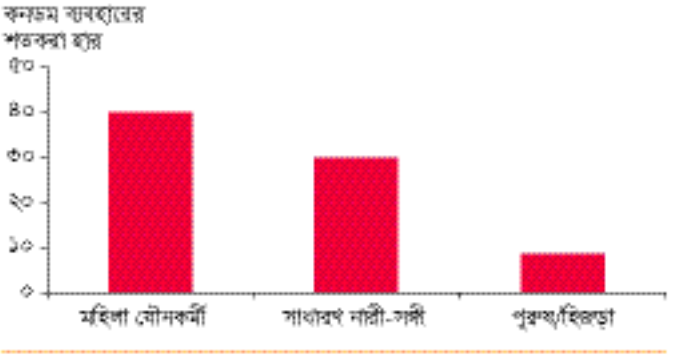

সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের মধ্যে কনডম ব্যবহারে পার্থক্য

গ্রামীণ এলাকার পুরুষদের তুলনায় শহুরে এলাকার পুরুষেরা বেশি কনডম ব্যবহার করেছে (সারণি ২)। পুরুষদের মধ্যে যারা ১০ বছর বা তার থেকে বেশি দিন স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করেছে (৪৯%), যাদের মাসিক পারিবারিক খরচ ১০,০০০ টাকার (১৪১ মার্কিন ডলার) বেশি (৬২%), অথবা অবিবাহিত (৪০%) তারা গত এক বছরে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমে তুলনামূলকভাবে বেশি কনডম ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছে। সাক্ষাৎদানকারীদের এইচআইভি-সংক্রমণ-সংক্রান্ত বর্ধিত জ্ঞানের সাথে কনডম ব্যবহারের হার বৃদ্ধির একটি যোগসূত্র রয়েছে।

চিত্র ৪: গত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গীর শতকরা হার

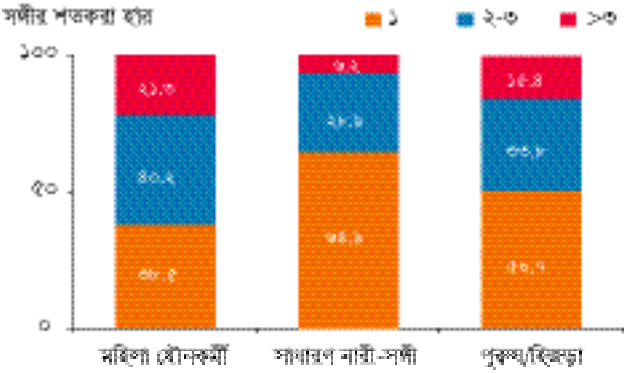

বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গীর সংখ্যা বণ্টন

সাক্ষাৎদানকারী যেসব ব্যক্তি গত এক বছরে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে, তাদের অধিকাংশেরই (৫৬%) একাধিক বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গী ছিলো। এক-তৃতীয়াংশের (৩৬%) ছিলো ২-৩ জন এবং

অন্য এক-পঞ্চমাংশের (২০%) ছিলো তিন জনেরও বেশি বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গী। বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গীর ধরন অনুযায়ী পার্থক্য করলে দেখা যায় যে, সাক্ষাৎদানকারীদের মধ্যে যারা নারী-যৌনকর্মীদের সাথে যৌন-সঙ্গম করেছে তাদের মধ্যে ৬২% একাধিক নারী-যৌনকর্মীর সাথে যৌন-সঙ্গম করেছে। একইভাবে ৩৫% সাধারণ নারী-সঙ্গীদের সাথে এবং ৪৯% পুরুষ/হিজড়াদের সাথে যৌন-সঙ্গম করেছে (চিত্র ৪)।

প্রতিবেদক: পাবলিক হেলথ সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল (এফএইচআই)

মন্তব্য

গবেষণাটির সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, প্রতিটি জেলার সাধারণ পুরুষ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এর মাধ্যমে দেশে এইচআইভি প্রাদুর্ভাবের একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা দেওয়া সম্ভব। শতকরা ২৭ ভাগ অবিবাহিত এবং ১৩% বিবাহিত পুরুষ গত এক বছরে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম করেছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশে অল্পকিছু গবেষণায় পুরুষদের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-আচরণের বিষয়টি উঠে এসেছে। কয়েকটি গবেষণায় বাংলাদেশের

সারণি ২: আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা সর্বশেষ বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমে কনডম ব্যবহার করেছিলো তাদের শতকরা হার

আর্থ-সামাজিক এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা	সাক্ষাৎদানকারীদের শতকরা হার
গবেষণা এলাকা		
ঢাকা মহানগর	২০৩	৪০
চট্টগ্রাম মহানগর	২১৩	৩৬
বগুড়া শহর	২৩৭	৩৫
ফরিদপুর পল্লী এলাকা	১৭০	৩৩
কক্সবাজার পল্লী এলাকা	২৪৯	২৪
রাজশাহী পল্লী এলাকা	১৯৪	২৭
পি ভ্যালু		<০.০১
বয়স (বছর)		
≤১৯	১৭৬	৪২
২০-২৯	৬৮৭	৩৫
৩০-৩৯	২৭৫	৩৬
≥৪০	১২৮	২৪
পি ভ্যালু		০.০৮
বৈবাহিক অবস্থা		
অবিবাহিত	৬৪১	৪০
বিবাহিত	৬২৫	৩০
পি ভ্যালু		<০.০১
শিক্ষা জীবন (বছর)		
০	২৯৩	২২
১-৪	২৫৮	৩১
৫-৯	৪৪৪	৩৭
≥১০	২৭১	৪৯
পি ভ্যালু		<০.০১
মাসিক পারিবারিক খরচ		
≤৩,০০০	৪৩৯	২৩
৩,০০১-৫,০০০	৪১৮	৩৪
৫,০০১-১০,০০০	৩৫২	৩৯
>১০,০০০	৫৫	৬২
পি ভ্যালু		<০.০১
ধর্মীয় পরিচয়		
ইসলাম	১,১৫৫	৩৫
অন্যান্য (হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান)	১১১	৪০
পি ভ্যালু		০.৫৫

সাধারণ পুরুষ জনগোষ্ঠীর ৮% থেকে ২৪% সদস্যের মধ্যে আজীবন বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সম্পর্কের অস্তিত্ব ধরা পড়ে (৩)। অন্য দু'টি উপ-জাতীয় (সাব-ন্যাশনাল) জরিপে দেখা যায় যে, ৪৭% পুরুষ বিয়ে-পূর্ব (৪) এবং ৫৬% পুরুষ বিয়ে-বহির্ভূত (৫) যৌন-সঙ্গম করেছে। বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তদের ওপর বাংলাদেশে সম্প্রতি করা একটি বিস্তৃত গবেষণায় দেখা যায় যে, ২২% পুরুষের বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গমের ইতিহাস রয়েছে (৬)। কিন্তু প্রাক্তন সব গবেষণাই হয় খুব ক্ষুদ্র পরিসরে করা হয়েছে বা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী নয়, অথবা বিস্তৃত পর্যায়ে বয়সসীমা এসব গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি; যার ফলে এসব গবেষণা এইচআইভি-সংক্রমণ-সংক্রান্ত যুতসই মডেল হিসেবে বিবেচ্য নয়।

আমাদের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পুরুষ জনগোষ্ঠীকে জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বিবেচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশে ১৮-৪৯ বছর-বয়সী পুরুষদের দ্বারা বছরে চার কোটি ৪২ লাক্ষ বার বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গম সংঘটিত হয় (এক কোটি ৯২ লক্ষবার নারী-যৌনকর্মীদের সাথে, এক কোটি ৪৮ লক্ষ বার সাধারণ নারী-সঙ্গীদের সাথে এবং এক কোটি দুই লক্ষ বার পুরুষ/হিজড়াদের সাথে)। এই জরিপে অবশ্য সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে সব বয়সের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় নি, তবে যে বয়সসীমার পুরুষ সবচেয়ে বেশি যৌনকর্মে সক্রিয় বলে মনে করা হয়েছে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসা একটি উদ্বেগের বিষয় হলো এই যে, আলোচ্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পুরুষেরা বিগত এক বছরে যতবার যৌন-সঙ্গম করেছে, তার তিন-চতুর্থাংশবার (তিন কোটি ১২ লক্ষবার) তাদের যৌন-সঙ্গম ছিলো অরক্ষিত, কারণ তারা কনডম ব্যবহার করে নি (সর্বশেষ যৌন-সঙ্গমের ওপর ভিত্তি করে কনডম ব্যবহারের এ-হার নির্ধারণ করা হয়েছে)। অরক্ষিত এসব যৌন-সঙ্গমের মধ্যে এককোটি ১৪ লক্ষবার নারী-যৌনকর্মীদের সাথে, এক কোটি ছয় লক্ষবার সাধারণ নারী-সঙ্গীদের সাথে এবং ৯২ লক্ষবার পুরুষ/হিজড়াদের সাথে তারা যৌন-সঙ্গম করেছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শুধু বিশাল-সংখ্যক যুবক শ্রেণী এইচআইভি ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে তাই নয়, তাদের সঙ্গীরাও রয়েছে এই ঝুঁকির মধ্যে।

বাণিজ্যিকভাবে এবং বিভিন্ন ধরনের যৌন-সঙ্গীর সাথে যৌনকর্মের উচ্চ হার, অন্যদিকে সবধরনের যৌন-সঙ্গমে কনডম ব্যবহারের হার কম হওয়ার ফলে এইচআইভি-সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা সীমিত, ইত্যাদি পরিস্থিতি এইচআইভি-সংক্রমণের একটি সম্ভাব্য বিস্ফোরন্মুখ অবস্থার ইঙ্গিতবাহী। দু'ভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় করা যায়। এক, যৌন-সঙ্গী সীমিত রাখতে পুরুষদের উৎসাহিত করা। দুই, বিয়ে-বহির্ভূত যৌন-সঙ্গীর সাথে যৌন-সঙ্গমে কনডমের ব্যবহার বাড়ানো (৭,৮,৯)। আলোচ্য গবেষণার সুপারিশ অনুযায়ী এইচআইভির সম্ভাব্য মহামারি প্রতিরোধের জন্য পুরুষদের যৌন-সঙ্গী পরিবর্তনের হার কমানো এবং কনডম ব্যবহারের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে পুরুষদের উৎসাহিত করতে হবে। আর এজন্য তাদের আচরণ পরিবর্তন-সংক্রান্ত কার্যকর যোগাযোগ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরি।

তথ্য সূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের গ্রমাঞ্চলে ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগজনিত সমস্যা

বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে অনেক লোক দীর্ঘমেয়াদী রোগজনিত সমস্যা নিয়ে বেঁচে আছেন বলে মনে হয়। দীর্ঘমেয়াদী রোগসমূহের ব্যাপ্তি এবং মৃত্যুর কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য আমরা বাংলাদেশের দু'টি গ্রামীণ উপজেলার জনসংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত মূল্যায়ন করেছি। যাঁদের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়েছে মোটের ওপর তাঁদের ৭৩% মিরসরাইয়ে এবং ৪৪% অভয়নগরে অন্তত একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগেছেন বলে তাঁদেরকে দেওয়া ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র থেকে জানা গেছে। যেসব দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভোগার কথা তাঁরা জানিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে গ্রন্থিবাত (আর্থাইটিস) (৩৭%) এবং উচ্চ-রক্তচাপজনিত (২৭%) রোগে ভোগা লোকের সংখ্যা বেশি। মৃত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, উল্লিখিত এলাকাসমূহে এ-বয়সী যতো মানুষ মারা গেছেন, তার অন্তত ৪২% মারা গেছেন দীর্ঘমেয়াদী রোগে। অন্যদিকে, ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে ভর্তি হওয়ার হার খুবই কম। বাংলাদেশে বয়স্ক লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে অর্থ বরাদ্দ এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগ-প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত কলা-কৌশল তৈরি করা উচিত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স-কাঠামো উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে যাচেচ্ছ। উনিশশ আশির দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্য বৃদ্ধির হার দ্রুত কমে যাওয়ার ফলে কম-বয়সী মানুষের অনুপাত কমে যায় (১) এবং শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে মানুষের গড় আয়ুও বেড়ে যায় – ১৯৭৫ সালে যা ছিলো ৪৪ বছর তা ২০০১ সালে ৬০ বছর পর্যন্ত বেড়ে যায় (২)। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা সাতভাগ ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষ আছে (১) এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এ-সংখ্যা বেড়ে আনুমানিক ১৬% হবে (৩)। বয়স্ক লোকের সংখ্যা যেহেতু বাড়ছে, সেহেতু দীর্ঘমেয়াদী রোগের ব্যাপ্তিও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী রোগজনিত সমস্যাটি অনুধাবন করতে পারলে তা এসব রোগ প্রতিরোধ এবং রোগে আক্রান্ত বর্ধিতসংখ্যক বয়স্ক লোককে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল তৈরি করতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগজনিত সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য আমরা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই এবং যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার উপাত্ত থেকে এ-বয়সী লোকদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগসমূহের ব্যাপ্তি, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কারণ ও মৃত্যুর কারণ-সংক্রান্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করেছি। দীর্ঘমেয়াদী রোগের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করার জন্য আমরা মিরসরাই এবং অভয়নগরে অবস্থিত আইসিডিডিআর,বির সার্ভিলেন্স এলাকায় তালিকাভুক্ত ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের ওপর একটি জরিপ করেছি। এই দু'টো এলাকা থেকে জনমিতি-সংক্রান্ত, বিয়ে, গর্ভধারণ, জন্ম, মৃত্যু এবং বাড়ি থেকে দুরে অবস্থান-সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলি নিয়মিত সংগ্রহ করা হয়েছে। জনমিতি-সংক্রান্ত সার্ভিলেন্স ব্যবস্থার নমুনা-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে (৪)। ষাটোর্ধ্ব-বয়সী সব লোককে তালিকাভুক্ত করার পর তাঁদেরকে তিনটি বয়সশ্রেণীতে বিভক্ত করা

হয়েছে, যথা, ৬০-৬৯, ৭০-৭৯ এবং ৮০ বছর বা তার থেকে বেশি-বয়সী। জরিপে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি সার্ভিলেন্স এলাকার উল্লিখিত বয়সশ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী থেকে ২৫০ জন পুরুষ এবং ২৫০ জন মহিলা দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। ২০০৫ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তরদাতাগণের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তাঁরা কখনো চিকিৎসককর্তৃক নির্বাচিত কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগেছেন কি না।

মিরসরাই এবং অভয়নগর উপজেলার ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মধ্যে যাঁরা ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত সেখানকার স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁদের সেখানে ভর্তির কারণসম্বলিত তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি সেখানকার পরিসংখ্যান থেকে। ২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত এই দু'উপজেলার স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে সংরক্ষিত সরকারি পরিসংখ্যান থেকে মৃত্যুর কারণসম্পর্কিত তথ্যাবলিও সংগ্রহ করা হয়। ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত মিরসরাই এবং অভয়নগর সার্ভিলেন্স এলাকায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্ত থেকেও মৃত্যুর কারণসমূহ পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন রোগ এবং রোগসম্পর্কিত সমস্যার আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানিক শ্রেণীবিভাগ (আইসিডি নবম সংস্করণ) অনুযায়ী দু'জন ডাক্তার মৃত ব্যক্তির পরিবার থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যুর কারণসমূহ চিহ্নিত করেন। ২০০৪ সাল থেকে সার্ভিলেন্স উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি পরিবর্তন করার ফলে ২০০৪-২০০৫ সালের মৃত্যুর কারণসমূহ এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

মিরসরাই এবং অভয়নগর সার্ভিলেন্স এলাকায় গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৩,০০০ ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মধ্য থেকে সর্বমোট ১,৫১৫ জনকে জরিপের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় (সারণি ১)। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা তালিকাভুক্ত সব মানুষের ওপর জরিপের কাজ সমাধা করতে পারিনি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বয়সশ্রেণীতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অনুপাত সার্ভিলেন্সের আওতাধীন জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ওই-বয়সী ব্যক্তিদের মতো একইরকম ছিলো। সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তিদের অধিকাংশই বর্ধিত পরিবারে বসবাস করতেন। বাংলাদেশে পুরুষ এবং মহিলাদের গড় আয়ু যদিও একইরকম, তথাপি পুরুষের তুলনায় অধিকসংখ্যক মহিলা তাঁদের স্বামী হারানোর কথা বলেছেন। সাক্ষাৎদানকারী পুরুষদের মধ্যে বেশিরভাগ ধূমপান করতেন বলে জানিয়েছেন (সারণি ১)।

সারণি ১: ২০০৫ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মিরসরাই এবং অভয়নগরে লিঙ্গ অনুযায়ী ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যসমূহ	মিরসরাই		অভয়নগর	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
সার্ভিলেন্সের অন্তর্ভুক্ত তালিকাভুক্ত ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষ	১,৪২৯	১,৬২৫	৮৭৮	৮৬৯
গবেষণায় মোট ব্যবহৃত নমুনা	৩৯৮	৩৭০	৩৭৪	৩৭৩
৬০-৬৯ বছর	২১৩	২১৫	২১৮	২৩৮
৭০-৭৯ বছর	১২৫	১১৮	১১৭	১০৭
৮০+ বছর	৬০	৩৭	৩৯	২৮
গড় বয়স ±এসডি	৬৯.৭±৭.৯	৬৯.৪±৭.৪	৬৯.০±৭.৪	৬৯.১±৭.২
বর্তমানে বিবাহিত (%)	৯২	২৮	৮২	৩৭
বর্তমানে বর্ধিত পরিবারে বসবাস করেন (%)	৬৫	৭৬	৬৪	৬২
বর্তমানে ধূমপান করেন (%)	৫০	.৫	৩৯	৩

যাঁদের ওপর সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাঁদের মধ্যে মোটের ওপর ৭৩% মিরসরাইয়ে এবং ৪৪% অভয়নগরে অন্তত একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগেছেন বলে তারা জানিয়েছেন, লিঙ্গ অনুযায়ী যেসব রোগের বিস্তারে ভিন্নতা দেখা যায় (সারণি ২)। যেসব দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভোগার কথা তাঁরা জানিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলো গ্রন্থিবাত (৫৪% মিরসরাইয়ে এবং ১৭% অভয়নগরে) এবং উচ্চ-রক্তচাপ (৩২% মিরসরাইয়ে এবং ২০% অভয়নগরে) (সারণি ২)। মিরসরাইয়ের মহিলারা সবচেয়ে বেশি দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভোগার কথা জানিয়েছেন (৮২%)।

সারণি ২: ২০০৫ সালে মিরসরাই এবং অভয়নগরে ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মধ্যে যাঁরা কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগেছেন লিঙ্গ অনুযায়ী তাঁদের শতকরা হার

নির্বাচিত দীর্ঘমেয়াদী রোগসমূহ*	মিরসরাই			অভয়নগর		
	পুরুষ (সংখ্যা=৩৯৮)	মহিলা (সংখ্যা=৩৭০)	উভয় (সংখ্যা=৭৬৮)	পুরুষ (সংখ্যা=৩৭৪)	মহিলা (সংখ্যা=৩৭৩)	উভয় (সংখ্যা=৭৪৭)
যেকোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ	৬৫	৮২	৭৩	৪০	৪৭	৪৪
গ্রন্থিবাত (আর্থ্রাইটিস)	৪২	৬৮	৫৪	১৮	১৭	১৭
উচ্চ-রক্তচাপ	২৭	৩৬	৩২	১২	২৮	২০
হৃদরোগ	১৬	৯	১৩	৬	৩	৫
ফুসফুসে সমস্যা	১১	৮	১০	৫	৫	৫
স্ট্রোক	১০	৫	৮	৮	৭	৭
বহুমূত্র রোগ	৮	৪	৬	৮	৪	৬
মানসিক সমস্যা	৩	২	২	০.৫	০.৮	০.৬
ক্যান্সার	২	৫	৪	১	০.৫	০.৮

*একাধিক উত্তর হতে পারে

২০০২-২০০৫ সাল পর্যন্ত ৯৮৮ জন ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষ মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিলেন, যাঁরা ওই সময়ের মধ্যে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর শতকরা পাঁচভাগ। এঁদের অধিকাংশই (৫৭%) ছিলেন পুরুষ এবং হাসপাতালে ভর্তি মোট রোগীর ২১% উচ্চ-রক্তচাপ, ফুসফুস এবং হৃদরোগজনিত দীর্ঘমেয়াদী রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। একই সময়ে ১,৫৫৪ জন ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষ অভয়নগর স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিলেন, যাঁরা ওই সময়ের মধ্যে সেখানে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর শতকরা সাত ভাগ। এঁদের মধ্যেও অধিকাংশই (৬৬%) ছিলেন পুরুষ এবং হাসপাতালে ভর্তি মোট রোগীর ৩৮% দীর্ঘমেয়াদী রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

মিরসরাই এবং অভয়নগর সার্ভিলেন্স এলাকায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায় যে, ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত সেখানে ষাটোর্ধ্ব-বয়সী যতো মানুষ মারা গেছেন, তাঁদের অন্তত ৪২% মারা গেছেন দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগে। সেসময়ের মধ্যে ওই-বয়সী মানুষেরা যেসব রোগে মারা গেছেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিলো হৃদরোগ (২৬%), বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা (সেনিলিটি) (২২%), শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ (১৫%), ম্যালিগন্যান্সি (৭%) এবং

স্নায়ুতন্ত্রজনিত সমস্যা (৬%) (সারণি ৩)। শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত এবং বার্ধক্যজনিত কারণে যেসব মৃত্যুর কথা এখানে বলা হয়েছে খুব সম্ভবত সেগুলোও দীর্ঘমেয়াদী কোনো রোগের ফলে সংঘটিত হয়েছে।

সারণি ৩: ২০০০-২০০৩ সালে মিরসরাই এবং অভয়নগরের মৃত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে প্রাপ্ত ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষের মৃত্যুর কারণসমূহ

মৃত্যুর কারণসমূহ	মিরসরাই সংখ্যা (%)	অভয়নগর সংখ্যা (%)	উভয় এলাকা সংখ্যা (%)
দীর্ঘমেয়াদী রোগের কারণসমূহ	২৩১ (৪০)	১৬৬ (৪৬)	৩৯৭ (৪২)
হৃদরোগ	১৪৩ (২৪)	১০১ (২৭)	২৪৪ (২৬)
ম্যালিগন্যান্সি	৪১ (৭)	২৬ (৭)	৬৭ (৭)
স্নায়ুতন্ত্রজনিত রোগ	৩৪ (৬)	২২ (৬)	৫৬ (৬)
বহুমূত্র রোগ	১৩ (২)	১৭ (৫)	৩০ (৩)
শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ	৯৫ (১৭)	৪৪ (১২)	১৩৯ (১৫)
বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা	১২৮ (২২)	৭৯ (২২)	২০৭ (২২)
অন্যান্য সংক্রমণ	১৩ (২)	৬ (২)	১৯ (২)
অনির্ণীত রোগ	১৩ (২)	১৭ (৫)	৩০ (৩)
অন্যান্য	৯৪ (১৬)	৪৯ (১৩)	১৪৩ (১৫)
মোট মৃত্যু	৫৭৪	৩৬১	৯৩৫

২০০০-২০০৫ সাল পর্যন্ত মিরসরাই এবং অভয়নগরের স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে ৬৭ জন ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষ মারা গেছেন। প্রায় সবগুলো মৃত্যুই হয়েছে হৃদরোগ (৩৩), হাঁপানি (১৯) এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ/জমাটবাঁধাজনিত (১০) কারণে।

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকূল্য: ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর দ্যা কনটিনিউয়াস ডেমোগ্রাফিক ইভালুয়েশন অব পপুলেশনস অ্যান্ড দেয়ার হেলথ (ইনডেপথ)

মন্তব্য

মিরসরাই এবং অভয়নগরে পরিচালিত গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ ষাটোর্ধ্ব-বয়সী মানুষ দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। জনসংখ্যাভিত্তিক এ-জরিপে দেখা যায় যে, ষাটোর্ধ্ব-বয়সী ৭৩% মানুষ মিরসরাইয়ে এবং ৪৪% অভয়নগরে অন্তত একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছিলেন। উক্ত দু'টি স্থানে রোগের ব্যাপকতায় এবং পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে রোগের ব্যাপ্তিতে কেন পার্থক্য বিরাজমান তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি। তবে অন্যান্য কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষদের তুলনায় বেশি মহিলা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগেছেন (৫,৬,৭)। রোগীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী রোগের যে ব্যাপ্তির কথা এখানে এবং অন্যান্য

গবেষণায় দেখানো হয়েছে (৭), তা সম্ভবত আসল হিসাবের থেকে কম। কারণ, তা শুধুমাত্র জরিপে অংশগ্রহণকারী রোগীদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী রোগ নিরূপণে নিয়মিত ডাক্তারী চিকিৎসাসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত জনগণের সুযোগ প্রথাগতভাবে খুব কম। একইধরনের জনগণের ওপর প্রতিবেশি ভারতে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ষাটোর্ধ্ব-বয়সী প্রায় সব মানুষই, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদী কোনো অসুখে ভুগেছেন (৫)। বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী রোগের ব্যাপ্তি সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে আরো গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে।

আইসিডিডিআর,বির মিরসরাই এবং অভয়নগর সার্ভিলেন্স এলাকার মৃত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্তে দেখা যায় যে, সেখানে ষাটোর্ধ্ব-বয়সী যতো মানুষ মারা গেছেন, তাঁদের অন্তত ৪২% মারা গেছেন দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগে। তবে শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ এবং বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিগণ সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদী রোগেই মারা গেছেন। ভবিষ্যৎ প্রতিবেদনসমূহে সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদী রোগে মৃত্যুর কারণসমূহকে আরো সঠিকভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হবে, কারণ বিভিন্ন রোগ এবং রোগসম্পর্কিত সমস্যার আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানিক শ্রেণীবিভাগের দশম সংস্করণ অনুযায়ী (আইসিডি ১০) ২০০৫ সালে বার্ধক্যজনিত রোগের সংজ্ঞা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। ওই দু'টি উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে যেসব মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই ছিলো দীর্ঘমেয়াদী কোনো রোগ-সংক্রান্ত। মৃত্যুর কারণসম্পর্কিত সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য এবং স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে খুব কমসংখ্যক মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার ফলে মৃত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত এবং স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সের উপাত্তের মধ্যে মৃত্যুর কারণসম্পর্কিত যে পার্থক্য ছিলো তা নির্ধারণে আমাদের সামর্থ ছিলো সীমিত।

ষাটোর্ধ্ব-বয়সী যতো মানুষ মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিলেন, তাঁরা ছিলেন ওই সময়ের মধ্যে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর শতকরা পাঁচ ভাগ এবং অভয়নগরে এজাতীয় রোগীর সংখ্যা ছিলো শতকরা সাতভাগ। ওই দু'টি স্থানে ষাটোর্ধ-বয়সী অধিকাংশ মানুষ দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা সত্তেও এসব রোগের চিকিৎসার জন্য ওই-বয়সী মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা খুব কম। বাংলাদেশে পরিচালিত আরেকটি গবেষণায়ও ওই-বয়সী মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার খুব কম দেখা গেছে (৮)। এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন, উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে দীর্ঘমেয়াদী রোগের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা যেহেতু সাধারণত থাকে না, তাই ওই-বয়সী মানুষেরা সম্ভবত অন্য কোথাও থেকে চিকিৎসা-সেবা নিচ্ছেন। এছাড়া, সম্ভবত যাঁরা চিকিৎসা-সেবা নেন না, তাঁরা তাঁদের অসুস্থতার জন্য এমনিতেই তা নেন না। তার কারণ, হয় তাঁদের তা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা-পয়সা নেই, অথবা তাঁরা তাঁদের শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসা-সেবা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অসচেতন। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত রোগের ইতিহাসভিত্তিক তথ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, সমাজের লোকজনের মধ্যে পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের জন্য চিকিৎসা বা সেবা নেওয়ার ব্যাপারে সাধারণত একটু কম আগ্রহ থাকে। এই জরিপ চলাকালীন সময়ে পরিবারের কম-বয়সী সদস্যেরা বয়স্কদের পরিবর্তে তাদের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সাক্ষাৎগ্রহণকারীদের প্রায়ই অনুরোধ করেছে। তারা বলেছে,

“বয়স্কদের কাছ থেকে এধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করে কী হবে, যেখানে কোনো ইন্টারভেনশন কর্মসূচিই তাঁদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারবে না; বরং তাঁদেরকে পরিবারের সাথে রেখে তাঁদের মতো করে থাকতে দেওয়াই ভালো যাতে তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকেন ধর্মকর্মে নিয়োজিত থাকতে পারেন”।

বাংলাদেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা যেহেতু বাড়ছে, সেহেতু অধিক হারে মানুষ দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগতে থাকবে। বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার কল্যাণ খাতে টেকসই উন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে, যেমন, বয়স্ক শ্রেণী। এই দৃঢ়তার কথা স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যাবিষয়ক কর্মসূচি ২০০৩-২০১০ (৯) এবং জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (১০)। দীর্ঘমেয়াদী রোগের বর্তমান সমস্যা এবং ভবিষ্যতে এধরনের রোগে আরো বেশি মানুষের ভোগার সম্ভাবনা আছে। ফলে এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগসমূহ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য আরো অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো এবং বয়স্কদের জীবনযাত্রার ধরন পাল্টানোর মতো কলা-কৌশল প্রবর্তন করা উচিত। একটি উপায় হতে পারে – ধূমপান অনুৎসাহিত করা, যেটি আলোচ্য এবং অন্যান্য গবেষণায় বাংলাদেশের পুরুষদের মধ্যে একটি প্রধান অভ্যাস হিসেবে দেখা গেছে (১১,১২)। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতিতে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার মধ্যে থাকবে উচ্চহারে সংক্রামক ব্যাধি এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগ-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করা। আরো গবেষণার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী রোগ-সংক্রান্ত সমস্যা আরো সঠিকভাবে নিরূপণ এবং এগুলোর প্রবণতা চিহ্নিত করা গেলে তা সরকারকে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সর্ম্পকে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: জুন ২০০৬-মে ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা = ১৬১)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৫৩৫)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৭.৩	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯২.৫	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৮.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩০.১	১.৭
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৮.১	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৭২.৫
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৭.১
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.২

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: জুন ২০০৬-মে ২০০৭*

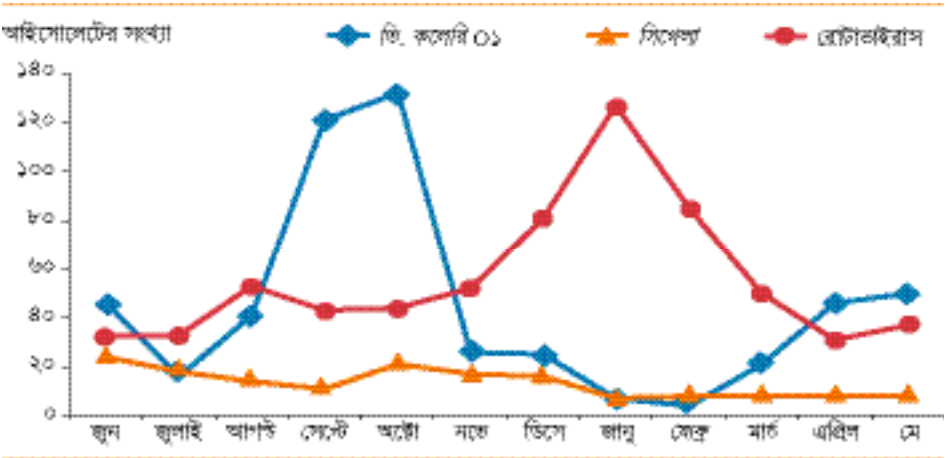

ওষুধের বিরুদ্ধে ১৮৫টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: মার্চ ২০০৬-ফেব্রুয়ারি ২০০৭

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট
	প্রাইমারি (সংখ্যা=১৬৭)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৮)	(সংখ্যা=১৮৫)
স্ট্রেপটোমাইসিন	৪১ (২৪.৬)	৯ (৫০.০)	৫০ (২৭.০)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১৪ (৮.৪)	৭ (৩৮.৯)	২১ (১১.৪)
ইথামবিউটাল	৭ (৪.২)	৩ (১৬.৭)	১০ (৫.৪)
রিফামপিসিন	১৭ (১০.২)	৬ (৩৩.৩)	২৩ (১২.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৬ (৩.৬)	৪ (২২.২)	১০ (৫.৪)
অন্যান্য ওষুধ	৫২ (৩১.১)	১০ (৫৫.৬)	৬২ (৩৩.৫)

() শতকরা হার * একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭ (সংখ্যা=৯)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীল (%)	রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	০.০	১১.১	৮৮.৯
পেনিসিলিন	০.০	০.০	১০০.০
স্পেক্টিনোমাইসিন	৮৮.৯	১১.১	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	০.০	০.০	১০০.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা* সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা* সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২০	২০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২০	৫ (২৫.০)	০ (০.০)	১৫ (৭৫.০)
ক্লোরামফেনিকল	২০	২০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	২০	২০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২০	১৮ (৯০.০)	২ (১০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	২০	০ (০.০)	০ (০.০)	২০ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	২০	১৮ (৯০.০)	২ (১০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর (শহরাঞ্চল) এবং টাঙ্গাইলের মির্জাপুর (গ্রামীণ) এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৭

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৪	১১ (৪৫.৮)	০ (০.০)	১৩ (৫৪.২)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৪	১১ (৪৫.৮)	০ (০.০)	১৩ (৫৪.২)
ক্লোরামফেনিকল	২৪	১১ (৪৫.৮)	০ (০.০)	১৩ (৫৪.২)
সেফট্রিয়াক্সোন	২৪	২৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৪	২৪ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর।

ষাটোর্দ্ধ-বয়সী একজন বাংলাদেশী মহিলা (সৌজন্যে: রবিউল হাসান)

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এই সংখ্যাটি আইএইচপি-এইচএনপিআরপি-র মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকাশিত।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সম্পাদনা বোর্ড:
চার্লস পি লারসন
এমিলি এস গারলি

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
এ্যালিজাবেথ অলিভেরাস
মাহবুব ইলাহী চৌধুরী
আলী আশরাফ

কপি সম্পাদনা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

বাংলা অনুবাদ:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহ্‌বুব-উল-আলম